শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বেকার

আবদুল খালেক (প্রাক্তন আই জি পুলিশ)

মৌলিক গণতন্ত্রের রাজনীতি হ্যাঁ-না তথা আস্থা ভোট-এর রাজনীতি, ঘরোয়া রাজনীতি, সংলাপের রাজনীতি, উৎপাদনের রাজনীতি এবং ভোটারবিহীন নির্বাচনী রাজনীতির প্রবাহে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাদকতা, চোরাকারবার, সশস্ত্র সন্ত্রাস, প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা, মিথ্যাচার ও দুর্নীতির অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। বিমান বন্দরে যাত্রীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাক্স পেটারা খুঁজে বের করা, সোনার বিরাট অংশ লা-পাত্তা হয়েছে। সিজ করা ভারতীয় শাড়ী-কাপড়, বিদেশী ঘড়ি এবং দান-অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বহিঃসম্পদের হিসেবে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সাবেক ধর্ম এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে কী পরিমাণ সোনাদানা ও মণিমুক্তা উপঢৌকন হিসেবে দেশের বাইরে নিয়েছেন তার সঠিক ভাষ্য পাওয়া যায়নি। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকন যা তোষাখানায় জমা হয় তাও এই মুহূর্তে চেক-আপ করে নেয়া দরকার। আমাদের গুদামের মালামাল, হাসপাতালের ওষুধপত্র, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা উধাও হওয়ার চাঞ্চল্যকর খবর মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় বের হয় কিন্তু এসব ব্যাপারে সংঘটিত তদন্ত অথবা বিচারের খবর বের হতে দেখা যায় না।

রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে সংসদ সদস্যদের অনাদায়ী ব্যাংক ঋণের হিসেব চাওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এরূপ সর্বনাশা ঋণের জন্যে অনেক নির্বাচন প্রার্থী অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন এবং অনেকের অযোগ্যতা এখনো বিচারাধীন রয়েছে বলে শোনা যায়। শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থার অনাদায়ী ঋণ পনেরশ' কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পাট কেনার জন্যে দেয়া ঋণের পরিস্থিতি আমাদের জানা নেই। গৃহ নির্মাণ সংস্থার ঋণ পরিশোধে সংস্থার ব্যক্তিবর্গ কী করলেন তারও খবর নেই। পক্ষান্তরে, সার্টিফিকেট কেসের উৎপীড়নে কৃষকরা দিশেহারা। এককালে এমপি হোস্টেলের বকেয়া টেলিফোন বিল সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়েছিল। ব্যস, এটুকুই। সরকার তো নিজেই বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধের নিয়ম-কানুন মানেন না। বিদ্যুৎ চুরির হিড়িক লেগেছে চারদিকে। মাসিক চুক্তি হিসেবে টাকা ব্যয় করলে টেলিফোন বিল ইচ্ছানুরূপ সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়ার দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছেছে বলে শোনা যায়।

সরকারী দলের সংসদ সদস্যরা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। শোনা যায়, তাদের উপমন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। ভোটার-শূন্য ভোটকেন্দ্র থেকে বিপুল ভোট সংগ্রহ করে যারা সংসদে এসেছেন তারাই এখন জেলা প্রশাসনে জনগণের প্রতিনিধি হলেন। সনাতন জেলা প্রশাসনে শত ঝড়-ঝাপটার পরেও নিরপেক্ষতার যে রেশটুকু টিকে ছিল তা এখন উবে যাবে বলে জনমনে আতংক সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের জোয়ারে শপথ গ্রহণ প্রথা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নেমে এসেছে। পল্লী পরিষদও শপথ গ্রহণ করে পুণ্যবান হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকা পৌর করপোরেশনের কমিশনারদের শপথ গ্রহণ পর্বকে উপলক্ষ করে রাজধানীতে ছয়-সাত ডজন বিরাটাকার ব্যয়বহুল তোরণ তৈরী করে তাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির একটি বিশেষ স্বপ্নকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। রাজধানীকে তিল তিলে তিলোত্তমা নগরীতে উন্নীত করার ঐ স্বপ্নটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজউক, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরো কতেক সংস্থা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছেন। বাড়ীঘর ও দোকানপাট রাজউকের ভাঙচুর প্রক্রিয়ার শিকার হয়েছে। ঝুপড়িবাসীরা বিতাড়িত হয়েছেন। রাস্তায় সোডিয়াম লাইটের ঝলক দেয়া হয়েছে। রাস্তাঘাট ও নর্দমার ধারেপাশে সিরামিক ইট সংযোজিত হচ্ছে। তিনশ' কোটি টাকার বিপণি কেন্দ্র এবং দু'শ' কোটি টাকার কারাগার স্থানান্তরের প্রকল্প এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রীপাড়ার চাকচিক্য বর্ধনের কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চটকদার এত কিছু হচ্ছে, কিন্তু কচুরিপানার কিছু হল না এবং ফুটপাথ দিয়ে নগরবাসীর চলার সৌভাগ্য কবে হতে পারে তা জানা গেল না। প্রণিধানযোগ্য যে, জৌলুসী অনুৎপাদক ব্যয় এবং রাজধানীর সৌন্দর্য আর্ত-ক্ষুধার্ত বেকার যুব সমাজের দেহ-মনের উৎকর্ষ বর্ধন এবং 'নয়ন-সুখ' সৃষ্টি করতে পারেনি।

কর্মের দাবীতে ক্ষোভ-বিক্ষোভের আশ্রয় নিয়েও কিছু হল না দেখে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কারিগর এবং অন্যান্য শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত কর্মহীন ব্যক্তিবর্গ বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। বিত্তবানরা আগেভাগেই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিদেশে লেখাপড়া শেখাবার সুযোগ করে নিচ্ছেন। উৎপাদনের রাজনীতির আমেজে দেশের পরীক্ষা সিস্টেম ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় ধ্বংসের পথে। উচ্চশিক্ষাকাঙ্ক্ষী যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তারা ক্ষুব্ধ। তাদের অভিভাবক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরাও ক্ষুব্ধ। শিক্ষা কমিশন কী সুপারিশ করেছেন তা জানার সৌভাগ্য কারো হচ্ছে না। আমাদের মতো একটা বিপন্ন জাতির শিক্ষানীতি, শিক্ষার ধারাপ্রবাহ এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশদভাবে আলোচিত হওয়া দরকার, সন্দেহ নেই।

অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অন্য কর্মহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের একটি সম্ভাব্য কর্মসূচীর রূপরেখা দৈনিক সংবাদ-এর ৬ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস তাদেরকে ''শিক্ষিত'' এবং যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস তাদেরকে ''উচ্চশিক্ষিত'' হিসেবে বিশেষভাবে আখ্যায়িত করে প্রতিবেদনে তাদের কর্মসংস্থান সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেছিলাম। দেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে দিশেহারা শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত যুব সমাজকে নিয়োজিত করার কথাই এখানে বিশেষভাবে বলছি।

মেয়ের চেয়ে ছেলের উচ্চশিক্ষার প্রতি জোর দেয়ার প্রবণতার কারণে শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা বাংলাদেশে খুবই কম। তা সত্ত্বেও মেয়েদের ক্ষেত্রে বেকারত্ব অধিকতর প্রকট। চাকরিজীবী মহিলাদের আবাসিক সমস্যা ছাড়াও মহিলাদেরকে চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট নাক সিটকানি রয়েছে। মহিলাদেরকে গৃহবন্দী ও চুলোমুখী জীবনে আটকে রাখার প্রবণতা শিক্ষিত মহলে কম, একথা বলা যাবে না। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী শিক্ষালয়ে মাতৃসুলভ শাসন-সোহাগে শিশু-কিশোরদেরকে শিক্ষাদানে মহিলাদের অবদান আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী অফিসে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে এবং কলকারখানায় ও শিল্প বাণিজ্যে মহিলাদেরকে সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য উন্নত দেশে অকাতরে নিয়োগ করা হচ্ছে। ভারতীয় কুটির শিল্প, বলতে গেলে, মহিলাদেরই দখলে। আমরাও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। আজকাল ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থপতিবিদ্যা ও আইন পেশায় মহিলারা এগিয়ে আসছেন। তবে তাদেরকে স্ব-নিয়োজিত হবার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনে কোন মহিলার স্থান নেই। বোর্ড, কমিটি, পরিষদ ইত্যাদিতে পুরুষের সমসংখ্যক মহিলার অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যাবে না। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে এবং পৌরসভায় ভোটাধিকারসহ পুরুষের সমসংখ্যক মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দিয়ে এই সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় মহিলাদের অবদান রাখার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বৈকি। জাতীয় সংসদে এবার মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বহাল রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়নি কেন, জানা যায়নি। পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে কমপক্ষে সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার দাবী মহিলা মহল থেকেও এসেছে।

এটা লক্ষ্য করেছি যে, গরীব ঘরের শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিতরা তাদের যোগ্যতার তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নতর পদের কর্ম পেয়ে থাকেন। প্রভাবশালীদের সংগে সামাজিক সম্পর্কহীনতা এবং কর্ম পাবার ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা খরচে সামর্থ্যহীনতার জন্যে এটা ঘটছে। তাদের মধ্যে বেকারত্বের তীব্রতাও বেশী। মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণা নিয়ে আমরা আজো সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট, রেলওয়ে, কাস্টমস, বন বিভাগ এবং বিবিধ সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং কলকারখানায় নিম্নপদে স্কুল-ছুট স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করছি, যদিও এসব পদে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস প্রার্থীকে নিয়োগ করে কাজের গুণগত মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যারা স্কুলের লেখাপড়া ছাড়ার আট-দশ-পনেরো বছর পর চাকরিতে আসেন তাদেরকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের জ্ঞানার্জনে উৎসাহী করে দক্ষ করে গড়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। স্বল্পশিক্ষিতরা চাকরি জীবনে প্রমোশন পেয়ে বেশী দূর এগুতে পারেন না বলে তাদের মন-মানসিকতায় স্থবিরতা দেখা দেয়। সে যাই হোক, আমাদের শিক্ষিতরা ক্ষেত-খামারের এবং মাঠ-ঘাটের কাজের দিকে যেতে উৎসাহী নন। সেজন্যে ফসল ফলানো, মৎস্য চাষ, পশুপাখী পালন, যান্ত্রিক কারিগরি ইত্যাদির যথোচিত বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। শিল্প কারখানার উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ও গুণগতমান বৃদ্ধি না করে বিশ্বপ্রতিযোগিতায় টিকে থাকার কথা ভাবা যায় না।

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশকে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী শিক্ষালয়ে নিয়োগ করে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন সম্ভব। প্রাইমারী স্কুলে ও মাদ্রাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস শিক্ষকের স্থলে স্নাতক এবং সেকেণ্ডারী স্কুল ও মাদ্রাসায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর ও বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক নিয়োগ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল, সাড়ে নয় হাজার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং প্রায় ত্রিশ হাজার প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী লেভেলের মাদ্রাসায় শিক্ষকের শূন্যপদে বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হতে পারে। মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে, অবসর গ্রহণ, চাকরি ত্যাগ এবং মৃত্যুজনিত কারণে যে কোন কর্মক্ষেত্রে বছরে শতকরা প্রায় তিনটি পদ শূন্য হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, গ্রামগঞ্জে যাতায়াতের অসুবিধা ও আরো কতেক কারণে বালিকারা তাদের গ্রাম থেকে দূরে অবস্থিত সেকেণ্ডারী স্কুলে যেতে চায় না। সেজন্যে সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে দূরবর্তী গ্রামের প্রাইমারী স্কুলেই বালিকাদের সেকেণ্ডারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যবস্থায়ও উচ্চশিক্ষিতদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

সরকারী ও বেসরকারী এবং অন্যান্য অফিস ও সংস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পরিবর্তে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাস নিয়োগ করা হলে কাজের গুণগত মান বাড়বে এবং কর্মচারীদের ধাপে ধাপে চাকরি জীবনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। তেমনি, স্নাতক ও অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার এক ধাপ উন্নয়ন করে প্রশাসনে উচ্চশিক্ষিতদের চাহিদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিভিন্ন চাকরিতে যোগ্যতার পুনর্বিন্যাস করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়বে বটে, তবে সেটা তেমন কিছু বেশী হবে না যা কতেক অনুৎপাদক খাতের ব্যয় পরিহার করলে সরকারের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশকে বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতায় শিল্পায়িত করার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের শিল্প বিদেশী বন্ধুদের শিল্পের প্রতিযোগী হয়ে উঠুক, এটা বিদেশীরা চাচ্ছে না। অবৈধভাবে প্রবেশকারী বিদেশী মালামাল আমাদের শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায়। তাছাড়া সরকারের আমদানী নীতিতে শিশু-শিল্পের চিন্তা-ভাবনা এখনো স্থান পায়নি। তদারকির অভাবে শিল্প ঋণ নিয়ে খাতকরা শিল্প ক্ষেত্রের